যুগান্তর
সাপ্তাহিকী

তারিখ 22 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পবিত্র সরকার

‘স্যারকে কত নম্বর দিয়েছিস রে?’

পুরনো স্মৃতি

‘মাস্টারমশাইদের পরীক্ষা’ নামে বছর কুড়ি আগে কলকাতার একটি পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলাম। তখন ব্যাপারটা এ দেশে খুব চালু হয়নি, লেখার পর শুনেছিলাম কোনো কোনো আইআইটি আর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে নাকি ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ আকারে ঘটত। মনে হয়েছিল, এসব প্রতিষ্ঠানে যারা কর্তাব্যক্তি বা প্রশাসনের ক্ষমতায় আছেন তারা সবাই বিদেশে শিক্ষা নিয়েছেন, তাই হয়তো তাদের বিষয়টা মনে ধরেছিল, এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে চালু করেছেন। আমারও লেখাপড়ার জন্য জন্মের মধ্যে কর্ম একবার বিদেশ যাওয়া— আগেকার দিনে খবরের কাগজে ‘উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা’ কথাটা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের একটা শিরোনাম ছিল— তাই আমিও সেখানকার অভিজ্ঞতা ‘ঝেড়ে’ই লিখেছিলাম। মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা এ দেশে বা আমাদের উপমহাদেশে চালু হলে বেশ হয়।

মনে হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের উপমহাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেমন সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে, একটা আধিপত্যের পরম্পরা দীর্ঘদিন চালু আছে। আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকা কথকতা বা ব্রতকথার মতো একটানা কথা বলে যাবেন, ছাত্ররা চুপচাপ মন দিয়ে শুনবে, উঁচু ক্লাসে ঘাড় গুঁজে লিখবে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করলেই ‘বেশি পেকে গেছিস মনে হচ্ছে’ গোছের বকুনি শুনতে হবে। আমাদের পাঠ্যবইয়ের ভাষাও ছিল একসময় সাধুভাষায়, যেটা এক ধরনের আধিপত্যের ভাষা ছিল, এখন তা বর্জিত হয়েছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ থেকে পাওলো ফ্রেইরি প্রমুখের চিন্তায় যে ছাত্রকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা উঠে এসেছিল, তা আমাদের দেশে আসতে বহু সময় লেগেছে, এখনও পুরোপুরি এসেছে বলে মনে হয় না। আজকের লেখাটা শিক্ষায় সেই ছাত্রছাত্রীর অধিকারের বিষয়ে।

অভিজ্ঞতার কথাটা বলি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাসের প্রথম কোয়ার্টার (১১-১২ সপ্তাহের পর্ব) শেষ হতে চলেছে প্রায়, এমন সময় একদিন ভাষার সিন্ট্যাকস বা অন্বয়ের মাস্টারমশাই জেরি সেডক ক্লাসে ঢুকেই সঙ্গে নিয়ে আসা একটা ম্যানিলা এনভেলপের ভেতর থেকে কতগুলো কাগজ বের করলেন, আর আমাদের আট-দশজন ছাত্রছাত্রীকে চটপট বিলি করলেন, বললেন, ‘এগুলো ভালো করে পড়ে তোমার মতামত লিখে দাও।’ আমরা দেখলাম তাতে আছে নানা ধরনের প্রশ্ন আর সেসবের উত্তরের নানা বিকল্প— আজকালকার ভাষায় ‘এমসিকিউ’ ধরনের প্রশ্ন। জেরি বললেন, ‘তোমাদের পছন্দসই বিকল্পে তোমরা শুধু টিক লাগাবে। এ কাজটা করার সময় আমার মুখের দিকে তাকাবে না, আমিও তোমাদের কোনো কিছু বলব না। ক্লাস শেষ হলে আমার হাতেও দেবে না কাগজগুলো— এই ম্যানিলা এনভেলপে ভরে দেবে, আমি তোমাদের সামনে সিল করব। তারপর এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে চলে যাবে। ধন্যবাদ।’

প্রশ্নগুলো সব হুবহু মনে নেই; কিন্তু ছিল অনেকটা এই রকম— কয়েকটি ভাগে ভাগ করে। প্রথমে শিক্ষক আর ক্লাসের সময় সম্বন্ধে— এই শিক্ষক কি ঠিক সময়ে ক্লাসে আসেন? ঠিক সময়ে ক্লাস ছাড়েন? মাঝখানটায় কি মোটামুটি পড়ার কথাই বলেন? তার পরেরটা পড়ানোর সহায়ক কাজ সম্বন্ধে— ঠিকঠাক বইপত্রে খোঁজ দেন? তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন? প্রশ্ন করলে বিরক্ত হন না? তোমাদের পেপার ঠিকঠাক দেখে দেন সময়মতো? তা নিয়ে আলোচনা করেন? ক্লাসের বাইরে তোমাদের জন্য সময় দেন? ক্লাসের ভেতরে ও বাইরে তার ব্যবহারে কি কোনো পার্থক্য আছে? তার পরেরটা পড়ানোর শৈলী নিয়ে— তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পাও তোমরা? তার ব্যাখ্যা যথেষ্ট প্রাঞ্জল বলে মনে হয়? আলোচনা বিষয়ের তুলনায় যথেষ্ট বলে মনে হয়? কখনও কি তাকে অপ্রস্তুত লাগে? কিংবা তার লেখা সম্বন্ধে— যা পড়েছ সেসব কি তোমাদের যথেষ্ট কাজে লাগে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অংশে শুধু দ্বিসম্ভব ‘হ্যাঁ/না’-র বাইরে গিয়ে আমাদের বলা হয়েছিল— তার উপস্থিতি ও পড়ানোর এ মানগুলোর মধ্যে একটিতে টিক দাও— ‘হতাশাজনক, চলনসই, ভালো, বেশ ভালো, চমৎকার। তোমার অন্যান্য শিক্ষকের তুলনায় একে তুমি কোথায় রাখবে— যোগ্য না অযোগ্য স্থানে?’

আমার মতো গ্রাম্য আর বাঙাল ছেলে তো কাগজটা পেয়ে খুব ঘাবড়ে গেল, হাতে নিয়ে কিছুটা থ মেরে বসে রইল। পাশের চেয়ার থেকে সহপাঠিনী ডি বলল, ‘কী হল? ভরছ না যে কাগজটা?’ আমি বললাম, ‘কী ভরব?’ ডি বলল, ‘শোনো, এখন জেরি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অস্থায়ী, শিক্ষা প্রশাসনের মার্কিন ভাষাতে টেনিওরড (tenured) নয়। আমাদের মতামত যদি তার অনুকূলে যায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ভাববে, না, একে টেনিওর দেয়া যেতে পারে, পাকাপাকিভাবে রাখা যেতে পারে। অবশ্য শুধু এটাই নয়, জেরিকে বই-টই, পেপার-টেপারও লিখতে হবে, জানোই তো আমাদের শিক্ষা প্রশাসনের নীতি হল Publish or perish! হও লেখা ছাপাও, নয়তো ডুবে মরো। কাজেই তুমি এই কাগজে মতামত দিলে জেরি সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মত স্থির করার দিকে এগোবে।’

এ কথা শুনে আমি আর দ্বিধা করলাম না। ভালো শিক্ষক জেরি, নানা পছন্দের কথাই লিখে দিলাম।

অনাচারিক ও আচারিক মূল্যায়ন

এটা ঠিক যে, শিক্ষকের মূল্যায়ন ঠিক এইভাবে আমাদের দেশে না হলেও ছাত্রছাত্রীরা অনাচারিকভাবে শিক্ষকের মূল্যায়ন চিরকালই করে এসেছে। ‘এই স্যার/ম্যাডাম খুব ভালো’, ‘এই স্যার/ম্যাডাম খুব রাগী’, ‘অমুকে বড্ড বোরিং’ এ ধরনের মন্তব্য ছেলেমেয়েরা সর্বত্রই করেছে, এবং ‘না রে, এখন এনবি-র ক্লাস, এ ক্লাসটা আমি কোনোভাবেই কাটতে চাই না।’ খারাপ শিক্ষকদের ক্লাস ছেলেমেয়েরা ‘কাটে’, ভালো শিক্ষকের ক্লাসে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। আমাদের সময়ের একটু আগে তো প্রাক-স্নাতক স্তরে অন্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা একজন ভালো শিক্ষকের ক্লাস শোনার জন্য আসত, প্রমথনাথ বিশী, ভূদেব চৌধুরী বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্লাস যেমন, এখন তারা সেটা করে কিনা জানি না। মনে রাখতে হবে, একজন ভালো শিক্ষক শুধু ক্লাসঘরে ভালো শিক্ষক নন, ক্লাসঘরের বাইরেও তিনি একজন ছাত্রদরদি মানুষ। তার সুদর্শন/সুদর্শনা বা নায়ক/নায়িকাসুলভ আকৃতির প্রয়োজন পড়ে না, পাঠদানে নাটকীয় হওয়ার দরকার নেই, যদি ছাত্রছাত্রীরা বোঝে যে এই স্যার বা ম্যাডাম আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন, তাহলেই তারা তাকে সম্মান বা ভালোবাসার জায়গায় বসাবে।

আমার দেখা চল্লিশ বছর আগেকার মার্কিন দেশে এই অসংগঠিত মতামতকে একটা সংগঠিত আর আচারিক (ফরম্যাল) চেহারা দেয়ার চেষ্টা ছিল ওই মূল্যায়নপত্র। তার লক্ষ্য ছিল শিক্ষকের স্থায়ীকরণ, অর্থাৎ তার পদোন্নতির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত, যা আগেই বলেছি।

এখানে আগেকার সব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতের ইউজিসি কোনো কোনো সংকীর্ণ এলাকায় এই মূল্যায়ন শুরু করেছে বেশকিছু আগে থেকে, সে খবরও রাখি। ইউজিসির প্ররোচনায় শিক্ষক উন্নয়ন বা (ফ্যাকাল্টি ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম— এফআইপি-তে) যেসব ‘রিফ্রেশার্স কোর্স’ ও ‘রিওরিয়েন্টেশন কোর্স’ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জন্য প্রতিষ্ঠিত নানা ফ্যাকাল্টি ইম্প্রুভমেন্ট কলেজের আয়োজনে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য— তাতে এই প্রথা চালু আছে বলে জানি, এ খবর আয়োজকদের কাছ থেকে পাই। তাতে শিক্ষার্থীরা আগত ‘রিসোর্স পারসনদের’ ‘গ্রেড’ করেন, অর্থাৎ এক নম্বর, দু’নম্বর— এরকম উৎকর্ষ-তালিকার মধ্যে নিয়ে আসেন। এসব খবর পেয়ে আমরা কেউ খুশি বা কেউ হতাশ হয়েছি, কেউ উদাসীন থেকেছি। কিন্তু যেহেতু এ বক্তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক, অনেকে অবসরপ্রাপ্তও। এই মূল্যায়নের দ্বারা তাদের কোনো বৈষয়িক উপকার হয়েছে বলে মনে হয় না। উদাসীনতার সেটাও একটা কারণ।

এই মূল্যায়নের একটা লাভ হল যে তা শিক্ষকদের আত্মসচেতন করে, আমি যা করছি তা যথেষ্ট ভালো করছি— এই আত্মতৃপ্তিতে ঢিল ছোড়ে এবং একটা চাকরি পেয়ে সারা জীবনের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম, এবার সুখে ঘরকান্নায় মন দেব— এই চিন্তা থেকে বের করে আনে। অবশ্যই শিক্ষকরা এখন এসব হুল্লোড়ের ফলে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, এবং নানা সেমিনার-সম্মেলনে তাদের প্রবন্ধ পাঠক ও শ্রোতা হিসেবে ভিড় করতে দেখে বুঝতে পারি তাদের নিজেদের পুনর্নবীকরণের জন্য তাদের বেশিরভাগ সব সময়েই প্রস্তুত।

প্রশ্ন তুলছে রাজনীতিকরণ

কিন্তু চাকরির পদোন্নতির সঙ্গে এই মূল্যায়নের ফলকে শর্ত হিসেবে বেঁধে দেয়া ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না। বরং তাদের গবেষণা, সেমিনার-ওয়ার্কশপে যোগদান ইত্যাদি এফআইপি কার্যক্রমের দিকে জোর থাক। না, ভয়টা রাজনীতির জন্য নয়। আমাদের ছাত্রজীবনে অনেক মাস্টারমশাই ছিলেন, যারা রাজনীতিতে আমাদের বিপরীত অবস্থানে ছিলেন। যেমন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী ও বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। তারা কেউ বামপন্থী রাজনীতি করার জন্য আমাদের পরীক্ষায় শাস্তি দেননি, উল্টো ঢেলে নম্বর দিয়েছেন। প্রমথবাবুকে এত বেশি নম্বর দেয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, ‘আরে পাঁচটা নম্বর তো আমি হাতে রেখে দিয়েছি!’ তারা কেউ ছোট মনের ছিলেন না। এর পাশাপাশি অবশ্য বলতে হয়, সবাই যে এমন ছিলেন তা নয়। কারও কারও নিজেদের মধ্যে প্রচুর আঁকচাআঁকচি ছিল। রিডার বা হেড হওয়ার জন্য দু’জন প্রতিযোগী একে অন্যের বিরুদ্ধে নানা কূট ষড়যন্ত্র করেছেন, একজন আরেকজন সম্বন্ধে পুরনো কেচ্ছা বের করছেন— এসবও আমাদের স্মরণকালের মধ্যেই ঘটেছে। সবাই সমান মহৎ ছিলেন না, তাও সমান সত্য। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে শেখার পাশাপাশি বাড়ির ‘সতরঞ্চিতে’ না বসলে ফার্স্ট ক্লাস আটকে যাবে এমন ভয়ও ছিল, হয়তো এখনও আছে। এগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ নেই, যোগ তার চেয়েও বড় শক্তির, অর্থনীতির।

তবু শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে শুধু ভিন্ন রাজনীতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেবেন, পরীক্ষার খাতায় বা অন্যত্র— এটা যেমন আমার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য লাগে (বা একই রাজনীতির জন্য পুরস্কার দেবেন তা-ও কতটা ঘটবে জানি না), তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে ভিন্ন রাজনীতির জন্য ভালো শিক্ষককে অবমূল্যায়ন করবে, এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। জানি না সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির প্ররোচনার শক্তি এখন কতটা; শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের এই বিশ্বাস আর স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্কের মধ্যে এখনই মারাত্মক ঘুণ ধরেছে কিনা। দিনকাল দ্রুত বদলাচ্ছে, তাই এ প্রশ্নের জবাব হয়তো শিগগিরই পাওয়া যাবে। পুরনো সময়ের লোক হিসেবে আমি এই ভরসাটুকু রাখতে চাই যে, শিক্ষক আর ছাত্রদের কোনো পক্ষই নিছক শিক্ষার আদান-প্রদানের মধ্যে কোনো রাজনীতিকে আনবেন না, পক্ষপাতেও নয়, শাস্তিদানেও নয়। জানি না, আমার এই অবস্থান ‘মূর্খের স্বর্গ’ হিসেবে এখনই চিহ্নিত হবে কিনা। তবে আমি বলি, ভারতের ইউজিসি এই ছড়ি ঘোরানোর নীতি থেকে সরে আসুক। তার এফআইপির নানা প্রকল্প কার্যকর হয়েছে, শিক্ষকরাও তাতে সাড়া দিয়েছেন। এভাবে ইউজিসি ভালো শিক্ষক তৈরিতে এবং শিক্ষকদের আরও ভালো শিক্ষক হতে সাহায্য করুক। কলেজ ও রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের মাইনে মূলত রাজ্যই দেয়, ইউজিসি দেয় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কিছু উন্নয়নের টাকা মাত্র দেয়, আর নতুন পদ দিলে প্রথম পাঁচ বছরের মাইনে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটাকে বলা হয় ‘পাঁচ বছর বাদে অনন্তকাল’— Eternity minus five years ফর্মুলা। বাকি সময় রাজ্যকে ওই মাইনে গুনতে হবে। তার অনুপাত বিশ গুণ না পঁচিশ গুণ, তা এখনকার শিক্ষা প্রশাসকরা বলতে পারবেন।

কাজেই এই প্রতিষ্ঠান ভাত কতটা দেয় তা তো জানি; কিন্তু গোঁসাই হয়ে কিল মারার ইচ্ছেটা সেই অনুপাতে তার বড্ড বেশি বাড়ছে। এটাতে বাধা দেয়া দরকার।

শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে শুধু ভিন্ন রাজনীতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেবেন, পরীক্ষার খাতায় বা অন্যত্র— এটা যেমন আমার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য লাগে (বা একই রাজনীতির জন্য পুরস্কার দেবেন তা-ও কতটা ঘটবে জানি না), তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও ব্যাপকভাবে ভিন্ন রাজনীতির জন্য ভালো শিক্ষককে অবমূল্যায়ন করবে, এ কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। জানি না সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির প্ররোচনার শক্তি এখন কতটা; শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের এই বিশ্বাস আর স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্কের মধ্যে এখনই মারাত্মক ঘুণ ধরেছে কিনা।

পবিত্র সরকার : *সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা; লেখক*